## ২. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ (The Great Revolt of 1857)

ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে প্রধান চ্যালেঞ্জ এল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনের শতবর্ষ পূর্তির বছরে। পলাশির যুদ্ধের পর ভারতে লর্ড ক্লাইভের হাত ধরে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকেই শাসক শক্তির বিরুদ্ধে একের পর এক প্রতিরোধের যে ধারা বহমান থেকেছে তার চূড়ান্ত ধাপ হল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ, যাকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেও কোনো কোনো ইতিহাসবিদ চিহ্নিত করেছেন। বিগত একশো বছরের ব্রিটিশ (কোম্পানি) অপশাসনে ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছেছে। অর্থনৈতিকভাবে প্রতিটি শ্রেণিই শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে। ভারত এবং ভারতবাসীর প্রতি এতটা অসম্মান, এতটা অবিচার এমনভাবে পূর্বে ঘটেনি। ব্রিটিশ শক্তি বিদেশি এবং তাদের আর্থিক স্বার্থ সাধনেই তৎপর হয়েছে নানাভাবে।[১২] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পূর্বে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ ছিল, কিন্তু এই শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও ব্যাপক বিদ্রোহ বলতে যা বোঝায় তা ঘটেনি। আসাম সীমান্তের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে খাসি উপজাতিরা প্রায় চার বছর ধরে লড়াই চালিয়েছে কিন্তু এই লড়াই ছিল একান্ত আঞ্চলিক এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে সীমিত। আকা, নাগা, কুকি, খোন্দ উপজাতির বা বাংলা, বিহার জুড়ে সাঁওতালদের বিদ্রোহ ব্যাপক সাড়া ফেললেও শেষ পর্যন্ত সাফল্য আসেনি, যেমন মাঝপথেই থেমে গেছে ছোটোনাগপুরের হো উপজাতি, মুণ্ডা বিদ্রোহ বা এর পূর্ববর্তী ভূমিজ ও চুয়ার উপজাতির বিদ্রোহ। পশ্চিমঘাট অঞ্চলে ভিলরা বা সাহারানপুরে গুর্জররা, রোটাকে জাঠরা, গুজরাটে কোলিরা উপজাতি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লড়াই চালিয়েছে। তবে এইসব তীব্র গণ-অসন্তোষ শেষপর্যন্ত জমাটবদ্ধ হল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিগত একশো বছরে ইংরেজ শক্তি ভারতবর্ষের সামাজিক-আর্থিক জীবনকে যেভাবে ধ্বংস করেছে, যেভাবে সর্বগ্রাসী শোষণের পথ কায়েম করেছে সেই পটভূমিতে এরকম একটি বিপ্লবের পরিস্থিতির সৃষ্টি যেন অনিবার্য করে তুলেছে।

ব্রিটিশ শাসনের এই ধ্বংসাত্মক চিত্র কার্ল মার্কস ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর *'British Rule in India'* রচনায় বর্ণনা করেছেন। বিদ্রোহের কারণ হিসাবে মার্কস মনে করেন গৃহযুদ্ধ, বিপ্লব, বৈদেশিক আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ কোনোটিই ভারতের জনজীবনের গভীরে প্রবেশ করেনি। কিন্তু ইংল্যান্ড যখন ভারতের সমাজ কাঠামোটিকে ভেঙে ফেলে এবং একে পুনর্গঠনের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয় না, দেশীয় শিল্প ধ্বংস করে, কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের সম্পর্ককে উপড়ে ফেলে তখন পরিস্থিতি আর আগের মতো থাকতে পারে না। ইংরেজ ঐতিহাসিক টমাস লো (Thomas Lowe), ফরেস্ট (G.W. Forest), গুবিনস (M.R. Gubins) সকলেই লক্ষ করেছেন বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল ইংরেজ শাসনের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা।[১৩]

### • বিদ্রোহের কারণ (Causes of Revolt)

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের মূল কারণ অবশ্যই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ও বিদ্বেষ। সন্দেহ নেই এই অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়-সামাজিক এবং অবশ্যই ব্রিটিশ সামরিক নীতির প্রতি তীব্র প্রতিক্রিয়া হিসাবে।

**(১) রাজনৈতিক কারণ :** ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের মুখ্য কারণ হিসাবে দেখা দেয় ব্রিটিশ শক্তির সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্যায় নীতি। সম্ভবত এই সাম্রাজ্য প্রসারের নীতি এদেশের রাজন্যবর্গকে ব্রিটিশ শাসকের প্রতি অবিশ্বাসী করে তুলেছিল। তারা এটা বুঝতে পেরেছিল আজ হোক বা আগামী দিনেই হোক ব্রিটিশ তাদের রাজ্যের দিকে হাত বাড়াবে। তাঁদের মধ্যে এই ভীতি সঞ্চারিত হয়েছিল লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ (রাজ্য দখলের) নীতিকে (policy of annexation) কেন্দ্র করে। ব্রিটিশ ভূখণ্ডের অধীনে আনা রাজ্যের প্রজারাও এ প্রশ্নে তাঁদের ক্ষোভ জমিয়ে রেখেছিল। নৃপতিদের প্রতি অসম্মান ও তাঁদের পরিবারের প্রতি বিদেশি অসৌজন্য তারা মেনে নিতে পারেনি। ঝাঁসি, অযোধ্যা সংযুক্তির প্রশ্নে রাজন্যবর্গ রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মুঘল রাজা বাহাদুর শাহের অসম্মান এবং তাঁকে দিল্লি থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেবার প্রস্তাব মুসলিমদের খুশি করতে পারেনি। দেশীয় নৃপতিবর্গের রাজ্য সংযুক্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের রাজ্য ইংরেজের দখলে যাওয়া নয়, নৃপতি-রাজ্যের প্রজাবর্গের ভাত-কাপড়, রুজি-

রোজগারের প্রশ্নেও সমস্যা সৃষ্টি করেছে। নৃপতি রাজ্যের সৈন্য-সামন্ত, প্রশাসন ও নানা কাজে নিযুক্ত কর্মীরা নিজেদের এই সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে আশ্রয়হীন মনে করেছে। কোম্পানির চিফ কমিশনার জ্যাকসন অযোধ্যা নবাবের আশ্রিত প্রজাদের সঙ্গে যে অশোভন আচরণ করেছিলেন ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য হয়ে এর ফলে তাঁর স্থানে হেনরী লরেন্সকে ওই পদে আনতে হয়েছিল। সন্দেহ নেই উত্তেজনার খোরাক এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান, নৃপতি-প্রজা, জনতা সবাই ছিল রীতিমত উত্তেজিত।

(২) **প্রশাসনিক কারণ** : ব্রিটিশ প্রশাসন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে জায়গিরদার, তালুকদার প্রভৃতি পদের অবলুপ্তি ঘটিয়েছে। ফলে এই শ্রেণির মানুষের সঙ্গে থেকে সাধারণ মানুষ যে সুবিধাদি পেত তা বন্ধ হল। অসন্তোষ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। ব্রিটিশ শক্তির কাছ থেকে সাধারণ দরিদ্র মানুষ কোনো সুবিধাই পায়নি, যাদের মাধ্যমে সাধারণের স্বার্থের সামান্য সুরাহা হতে পারত সেই ধনীরাও তাদের অধস্তন কর্মীদের হারিয়েছে। ব্রিটিশ পুলিশি ব্যবস্থা এই সময় এতটা কার্যকর ছিল না যা সাধারণ মানুষকে তার জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষায় সাহায্য করতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে রায়তওয়াড়ি বা মহলওয়াড়ি ব্যবস্থার সূচনা করেছে দরিদ্র কৃষক তা থেকে কোনো সুবিধাই পায়নি। এই ব্যবস্থা তাদের কর ও ঋণভারে জর্জরিত করেছে, জমির খণ্ডীকরণ প্রক্রিয়া জমিহারা করেছে, অসংখ্য ভূমিহীন শ্রমিক সৃষ্টি করেছে। ব্রিটিশ রাজস্ব প্রশাসনের বলি হয়েছে লক্ষ লক্ষ কৃষক। সবচেয়ে বিসদৃশ ব্যাপার হল ভারতীয়রা তাদের প্রত্যাশিত প্রশাসনিক পদ হারাল। শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে এ নিয়ে প্রবল ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

(৩) **অর্থনৈতিক কারণ** : ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক আধিপত্য এবং মুখ্যত এই আধিপত্য বজায় রাখা ও বৃদ্ধির প্রধান কৌশল ছিল আর্থিক শোষণ। বাংলাদেশে সুবা (Suba) লাভ ও প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদের রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপনের সূচনা যা ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে অন্যান্য প্রদেশে। এরপর থেকেই ভারত থেকে বিপুল পরিমাণে সম্পদ লুট ও নির্গমনের পথ প্রশস্ত করতে থাকে ব্রিটিশ শাসক। দাদাভাই নৌরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত কীভাবে ভারত থেকে সম্পদ নির্গমন হয়েছে তার তত্ত্ব পেশ করেছেন।[১৪] নৌরোজি লিখেছেন, 'Out of the revenues raised in India, nearly one-fourth goes clean out of the country, and is added to the resources of England' and that India was consequently 'being continuously bled.'[১৫] রানাডে বলেছেন কেমনভাবে ভারতের সম্পদের ও মেধার নির্গমন ঘটেছে বিদেশের অধীনে এসে। রমেশচন্দ্র দত্তের কথায়, "So great an economic drain out of the resources of a land would impoverish the most prosperous countries on earth; it has reduced India to a land of famines more frequent, more widespread, and more fatal, than any known before in the history of India or of the world."[১৬]

ব্রিটিশ শক্তি ভারতে কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের ধ্বংসসাধন করেছে। এর সঙ্গে রাজস্ব নীতির যাবতীয় প্রতিক্রিয়া প্রভাব এ দেশের কৃষককে দরিদ্র থেকে হতদরিদ্র করেছে এবং তাঁদের বাঁচার পথ ন্যূনতম স্তরে নামিয়ে এনেছে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যাবসার অবসান এবং অবাধ বাণিজ্য নীতি ভারতে শোষণের রূপকে আরও কদর্য করে তুলেছে। এদেশের রেশম শিল্প ব্যাপক প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে বিপর্যস্ত হয়েছে। ভারত হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ শিল্প উৎপাদনের উপকরণ জোগানোর উর্বর ক্ষেত্র। এদেশ থেকে সম্পদ নির্গমনের ও দারিদ্র্যের চিত্র প্রকট হয়ে উঠেছে।

(৪) **সামাজিক-ধর্মীয় কারণ** : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পথকে প্রশস্ত করেছে ভারতবাসী সম্পর্কে ব্রিটিশ জাতিগত বৈষম্য ও সামাজিকভাবে এদেশের মানুষকে হেয় করার ক্ষতিকর মনোভাব ও প্রচেষ্টা। ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে প্রভেদ ও বিভেদের এমন হীন নীতি পূর্বে ভারতের ইতিহাসে ছিল না। সরকারি ক্ষেত্রে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা, ভারতীয় নারীদের প্রতি অসম্মানের এমন নজির এদেশে ছিল না। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার এই ধারা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। খ্রিস্টধর্ম প্রচারকেরা এই জাতিগত বৈষম্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা প্রশ্রয় পেয়েছে। খ্রিস্টীয় মিশনারিরা নিজস্ব বিদ্যালয় গড়ে আধুনিক ও নারী শিক্ষায় উদ্যোগী হলেও ধর্মান্তরকরণের সংকীর্ণ প্রচেষ্টা থেকে এরা বিরত থাকেনি। চার্টার আইন (১৮১৩) খ্রিস্টীয়

প্রচারকদের সামনে যে সুযোগ এনে দিয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ নিতে তারা কার্পণ্য করেনি, পাঠক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। জেলের কয়েদি, হাসপাতালের রোগী, শিক্ষার্থীর মনে আতঙ্ক ছড়াতে ব্রিটিশ আইন কসুর করেনি। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে ১৮৩২ ও ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের আইন বা ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ধর্মীয় অসামর্থ্য আইন (The Religious Disabilities Act) ধর্মান্তরিত হলে কেউ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না এই নির্দেশ জারি করে ধর্মান্তরের ব্যবস্থাকে পাকা করতে চেয়েছে। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সতীদাহ বিরোধী বা বিধবা বিবাহ আইন ব্রিটিশ সমর্থন পেলেও রক্ষণশীল হিন্দুদের কাছে ঐতিহ্য ও ধর্মবিরোধী বলে গণ্য হয়েছে।

(৫) **সামরিক কারণ** : আতঙ্ক ও সন্দেহের এই বাতাবরণ ছড়িয়ে গেছে সামরিক ক্ষেত্রেও। সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত ভারতীয়রাও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের দাবি নিয়ে সরব হয়েছে। স্বল্প বেতন নিয়ে সৈন্যদের বিরাট অভিযোগ ছিল। ব্রিটিশ সেনার সঙ্গে তাদের বেতন ও ভাতার বৈষম্য ছিল প্রকট। বঙ্গীয় সেনাদের একটা বড়ো অভিযোগ ছিল—ব্রিটিশ সরকার সেনাবাহিনীতে রাজপুত ও ব্রাহ্মণদের নিয়োগের পূর্বের অধিকার খর্ব করে নিচু জাতের মানুষকে সুযোগ দেবার নীতি নিয়ে। অযোধ্যা রাজের দখলি স্বত্ব বিলোপ নিয়ে সেনাবাহিনীতে রীতিমতো আলোড়ন ঘটেছে। নবাবের অধিকার খর্বের সঙ্গে সঙ্গে যে নবাবের অধীনে নিযুক্ত কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফাঁক সৃষ্টি হয়, তারাও যে প্রাপ্য অধিকার হারায়, অসহায় হয়ে পড়ে ও ব্রিটিশ সরকারের বিরোধী হয়ে পড়ে এটা অনুভব করার মতো ধারণা সরকারের ছিল না। বঙ্গীয় রেজিমেন্ট ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনার প্রধান শক্তি এবং এদের অসন্তোষ এই শক্ত ভিতকে নড়িয়ে দিয়েছে। দূরদূরান্তরে অতিরিক্ত মজুরি ছাড়া যুদ্ধে পাঠানোর নীতি বা আর্থিক অধিকারের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়িয়েছে। লর্ড ক্যানিং-এর সামরিক নির্দেশ জারির বিরুদ্ধে (The General Service Enlistment Act) তাদের ব্যাপক হতাশা ছিল। বিদেশে বার্ধক্যকালীন সুবিধা ছাড়া নিয়োগের নীতি বা ব্রিটিশ সেনার তুলনায় তাদের নিয়োগ ও সুবিধাদি কম পাবার ব্যবস্থা বা বিধান তারা মেনে নিতে পারেনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী যে প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েছে তা তাদের মানসিক শক্তিকে ক্ষয় করেছে।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে **'এনফিল্ড রাইফেল'** (Enfield Rifle) ব্যবস্থা বা বিধান দমদম, আম্বালা, শিয়ালকোট সর্বত্র তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্গদেশের সৈন্যবাহিনীর মুখে মুখে একটি গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। দমদম রেজিমেন্টের এক ব্রাহ্মণ সৈন্য তার জলের বোতল নিয়ে ফিরে আসার সময় এক নমশূদ্র তৃষ্ণার্ত খালাসি (অর্ডিন্যান্স কারখানায় কর্মরত) তার কাছে জল চায়। সৈন্যটি নিচু জাত বলে খালাসিকে জল দিতে অস্বীকার করলে খালাসিটি ক্ষুব্ধ হয়ে জানায় ব্রিটিশ সরকার জাতপাতের তোয়াক্কা না করে সব জাতের সৈন্যকেই গোরু ও শূকরের চর্বিমিশ্রিত কার্তুজ ব্যবহারে বাধ্য করছে। ব্রাহ্মণ সৈন্যটি খালাসিটির এই ধারণায় বিশ্বাস করে এবং তা অন্য সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। ব্যারাকপুরের সৈন্যদের মধ্যে এই গল্প ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৯তম রেজিমেন্টের সৈন্যরা কার্তুজ ব্যবহারে অস্বীকার করে। ব্রিটিশ সরকার এই গল্পকে গুজব বলে অস্বীকার করলেও হিন্দু ও মুসলিম সৈন্যরা কার্তুজ ব্যবহার না করার সংকল্পে অনমনীয় থাকে। সিপাহি বিদ্রোহের পেছনে এই কারণটি *কতটা গল্প আর কতটা বাস্তব এ প্রশ্নে ঐতিহাসিকেরা একমত না হলেও, কার্তুজ কাহিনি বিদ্রোহের প্রথম এবং তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে উঠে এসেছে সন্দেহ নেই।*[১৭] প্রথম মিরাটের সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। মঙ্গল পাণ্ডের ব্যারাকপুর রেজিমেন্টের বিদ্রোহ (৩৪ রেজিমেন্ট), ব্রিটিশ অফিসারকে গুলি, মঙ্গল পাণ্ডের প্রাণদণ্ড, ব্যারাকপুর, আম্বালা, লক্ষ্ণৌ রেজিমেন্টকে ভেঙে দেবার ঘটনা দিয়ে বিদ্রোহের সূত্রপাত।

• **বিদ্রোহের অন্যান্য ঘটনা** (Other events of the Revolt) : কার্তুজ ব্যবহারে অস্বীকার করা থেকে বিদ্রোহের সূচনা বলে রটানো হলেও একের পর এক ঘটনা ঘটতে শুরু করে। কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করাকে অপরাধ গণ্য করে ইংরেজ সরকার বিভিন্ন রেজিমেন্টের সৈন্যবাহিনীকে ভেঙে দিতে থাকে। মিরাটের তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনী বাতিল করা হল। ৮৫ জন সৈন্যের টোটা ছুঁতে অস্বীকার করার অপরাধে ১০ বছরের কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হল। মার্চের মঙ্গল পাণ্ডের ঘটনা, এপ্রিলের তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনী ভেঙে দেওয়া বিদ্রোহকে

আরও উন্মুক্ত করেছে। অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল পদাতিক বাহিনী। সৈন্যদের হাতে বহু ব্রিটিশ অফিসার ও সাধারণ কর্মী নিহত হল। বিদ্রোহীরা ১১ মে দিল্লি দখল করল এবং বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট (হিন্দুস্তানের বাদশাহ) ঘোষণা করল। ১৩ ও ১৪ মে ফিরোজপুর, মুজফ্‌ফরনগরে বিদ্রোহ ঘটে, বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে আলিগড়, পাঞ্জাবের নওশেরা, উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া ও মৈনপুরীতে। মথুরা, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, শাজাহানপুর, মোরাদাবাদ, আজমগড়, সীতাপুর, বারাণসী, কানপুর, ঝাঁসি, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, ফতেপুর সর্বত্র ব্যাপক লড়াই ও হাঙ্গামায় বহু ইংরেজ সৈন্য হতাহত হল, জেলখানা ভেঙে কয়েদিদের বেরিয়ে আসতে সাহায্য করা হল, লুণ্ঠনকার্য চলতে থাকল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের প্রথম ছ-মাস নেতৃত্বে ছিলেন কানপুরে নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপি, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, ইন্দোরে হোলকার, বিহারে জগদীশপুরের রাজপুত জমিদার কানওয়ার সিং। বিদ্রোহের সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাক্রম হল :

(১) বিহার ও বাংলায় ওয়াহাবিদের বিদ্রোহের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ; ওয়াহাবি আন্দোলন চলেছেও পরবর্তী দু'দশক জুড়ে।

(২) সম্বলপুরে সুরেন্দ্র সাই-এর বিদ্রোহ;

(৩) মহারাষ্ট্রে রূপ সিং-এর বিদ্রোহ;

(৪) বিদ্রোহ হয় অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড, মগধ ও নর্মদায় উত্তর ভারতের চারটি প্রদেশে এবং বিহার, আগ্রা, মিরাটে সিপাহিদের অভ্যুত্থান ছিল চোখে পড়ার মতো।

(৫) রাজপুত, ব্রাহ্মণ, মুসলমান, মারাঠা সব শ্রেণির মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম লক্ষ করা গেছে।

(৬) সশস্ত্র কৃষকদের অভ্যুত্থান মিরাট, লক্ষ্ণৌ, বুন্দেলখণ্ড, কানপুর সর্বত্র ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলে।

(৭) বিদ্রোহকে উপলক্ষ্য করে হাতিয়ারাজা বলে খ্যাত ভুটানের হরফ সিং নামক ব্যক্তি বিদ্রোহী সিপাহিদের সাহায্য করেছেন। সরকারি কারাগারের চিকিৎসক হুগলি জেলার কুরেরচন্দ্র চৌধুরীও রাজদ্রোহী কার্যকলাপে যুক্ত হন। যশোহর জেলার পরাগ ধোবীও ইংরেজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়েছেন।

(৮) এই পর্বে বিদ্রোহী সিপাহিদের রাষ্ট্রীয় সভা ও মোগল পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাহাদুর শাহ সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তে যোগ দেননি, অথচ সিপাহিরা তাকেই দেশের নেতা মেনে অগ্রসর হয়েছে, ইউরোপীয় কর্মচারীদের হত্যা করা শুরু হলে বাহাদুর শাহকে কার্যত বন্দি জীবনযাপন করতে হয়। বিদ্রোহীদের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলেও তাদের সিদ্ধান্ত মেনেই তাঁকে চলতে হত, দলিল, দস্তাবেজে স্বাক্ষর করতে হত। বিদ্রোহীরা এবং ইংরেজ সরকার উভয় তরফ থেকে তাঁর জীবন বিপন্ন করে তোলা হয়েছে, ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সভা ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে কার্যত 'ভারত সম্রাটের' সব ক্ষমতাই খর্ব করে। পরোয়ানা জারির মাধ্যমে ভারত সম্রাটের মর্যাদা দিলেও শাসন, বিচার ও আইনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সভাই ছিল কেন্দ্রীয় শক্তি। শান্তি রক্ষা, রাজস্ব আদায়, মহাজনদের কাছ থেকে ধন সংগ্রহ, যুদ্ধ পরিচালনা সব কিছুর ক্ষমতাই ছিল রাষ্ট্রীয় সভার হাতে। বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও উত্তরাধিকারী (মির্জা মোগল) মোগলকে বিদ্রোহী সেনার সেনাপতি হিসাবে মনোনীত করা হলেও সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছে রাষ্ট্রীয় সভা। লক্ষণীয় মোগল পরিবারের সদস্যরা (বেগম জিনৎমহল, প্রধানমন্ত্রী আপাতুল্লা, জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা মোগল ও মোগল সম্রাটের কর্মচারীদের একটি বড়ো অংশ বিদ্রোহীদের কাজে খুশি ছিলেন না, গোপনে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। যুদ্ধ ও শাসন পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় সভার বিত্তশালী শ্রেণিদের কাছে বেশি করে ঋণের দাবি, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের দাবি বা প্রকৃত চাষিদের হাতে জমিদানের ভূমিকাটি ধনী কৃষক ও বিত্তশালীদের খুশি করেনি।

(৯) বিদ্রোহের আর-এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বাহাদুর শাহ আত্মসমর্পণ করার ঘটনা ঘটার আগেই নানাসাহেব নিজেকে 'স্বাধীন পেশোয়া' বলে ঘোষণা করেন। নানাসাহেবকে চ্যালেঞ্জ করার দায়িত্ব নেন ইংরেজ সেনাপতি হ্যাভলক। নানাসাহেব সাফল্য না পেলেও, ইংরেজ সৈন্য এই পর্বে মড়ক, যোগাযোগের অসুবিধা ইত্যাদি নানা কারণে বিপন্ন হয়েছে। বিদ্রোহ চলাকালীন হ্যাভলককে লক্ষ্ণৌ চলে যেতে হয়, কারণ সেখানে বিদ্রোহের আগুন নেভেনি। এখানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন নানাসাহেবের অনুগত কর্মী তাঁতিয়া টোপি। সৈন্য সমাবেশ ও আক্রমণে পারদর্শী তাঁতিয়া টোপিকে হ্যাভলক বাহিনীর সম্মুখে পড়ে গোয়ালিয়রে চলে যেতে হলেও সেখান থেকেই তিনি সৈন্য সংগ্রহ, সমাবেশ ও যুদ্ধ করে কানপুর শহর দখল করেন। এই সময় কলিন ক্যাম্পবেল ইংরেজ পক্ষের হয়ে কানপুরে এসে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হন। তাঁতি বাহিনী পরাজিত হয় ও পলায়ন করে। এই পর্বে লক্ষ্ণৌ-এ ইংরেজের বিরুদ্ধে বীরের লড়াই চালান মৌলভী আহমদ উল্লা।

(১০) এই পর্বে বিদ্রোহের অপর কিছু ঘটনা বেরিলি বিদ্রোহী, শক্তি মান বাহাদুর খানের পরাজয়, অযোধ্যা ও মধ্যভারতেও বিদ্রোহী বাহিনীর পতন। তবে এই পর্বে বিদ্রোহের ঐতিহাসিক অবদান হল ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই-এর ঝাঁসির দুর্গ প্রতিরোধের অনমনীয় প্রয়াস। হিউরোজের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী তাঁকে পরাজিত করলেও বা তাঁর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করলেও রানিবাহিনী পুনরায় শক্তি সংগঠিত করে কাল্পিতে তাঁতিয়া টোপির সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ চালান। নানাসাহেবের ভাগ্নে রাও সাহেব, বান্দার নবাব, তাঁতিয়া টোপি, ঝাঁসির রানির মিলিত প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া বাহিনীকে নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টাও ব্যর্থ হয় হিউরোজের ও স্মিথের কৌশলে। গোয়ালিয়র ও কোটাকের পার্বত্য অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করেও ঝাঁসির বাহিনী পরাজিত হল এবং রানি বীরের মৃত্যুবরণ করলেন। হিউরোজ রানি লক্ষ্মীবাইয়ের সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করেছেন।

(১১) এর পরেও তাঁতিয়া টোপি, সিন্ধিয়ার উৎখাতপ্রাপ্ত সামন্ত মান সিং, বিহারের কুণওয়ার সিং, অমর সিং, অযোধ্যার বিদ্রোহীরা গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। তাঁতিয়া টোপির ফাঁসি হলেও, নানাসাহেব বিদ্রোহ পরিচালনায় তেমনভাবে সমর্থ না হলেও, এটাই ঘটনা সকল বিদ্রোহী ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি বলে বিদ্রোহ সাফল্য পেল না। ক্যানিং স্বীকার করেছিলেন সিন্ধিয়া যোগ দিলে ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে হয়তো এ বিদ্রোহ মোকাবিলা করা সম্ভব হত না। ব্রিটিশ সৈন্যও আর ভারতে পর্যাপ্ত ছিল না। সৈন্য, রসদ সব কিছুই আনতে হয়েছে বিদেশ থেকে (পারস্য, সিঙ্গাপুর)। তবে একটা বিরাট এলাকা জুড়ে বিদ্রোহের ব্যাপ্তি ঘটেছে, ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, সিপাহিদের সঙ্গে জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে। বিদ্রোহ সাফল্য না পেলেও তা যে ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য হয়ে উঠেছে, লেখক ও ঐতিহাসিকদের বিবরণ ও পর্যালোচনার সূত্রে তা জানা যায়।[১৮]